শ্মশান বাতি

অসিত রায়

জাতির উদ্দেশ্যে সরকার প্রধানের ভাষণ শুনতে সন্ধ্যার পর থেকে আসন পেতে টেলিভিশনের সামনে বসে আছেন শুক্লার বাবা হীরালাল। হীরালালকে সমবয়স্ক প্রতিবেশীরা হীরুবাবু, কেউ আবার শুক্লার বাবা বলেও ডাকে। হীরুবাবুর দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগে তিন বছর আগে স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলে মেয়েরা সকলেই বিবাহিত।

গ্রামে বিদ্যুৎ আসার পর থেকে হীরুবাবুর সময় ভালই কাটে। সত্যি কথা বলতে কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও ভিডিও ডিভিডি দেখেই কেটে যায় সময়। গত বছর তার ছোটো ছেলে ইতালী থেকে আসার সময় উন্নত মানের ভিডিও কেসেট প্লেয়ার ও ডিভিডি প্লেয়ার নিয়ে এসেছে যাতে বাবা রামায়ন মহাভারত দেখে অবসর সময় কাটাতে পারেন। এই বুড়ো বয়সে টেলিভিশনের অনেক অনুষ্টান মনে রাখতে পারেন। বিশেষ করে ইংরেজী অনুষ্টানগুলো। ইংরেজী অনুষ্টান দেখার আসল কারন ভাষাতে দক্ষতা ও বিয়ের আগে চার বছর আমেরিকাতে ছিলেন।

সন্ধ্যার আগে থেকেই রান্নার ছেলে উমেশ কে বলে রেখেছিলেন, জাতির উদ্দেশ্যে সরকার প্রধানের ভাষণ দেয়ার সময় সে যেন বিরক্ত না করে কিংবা কেউ যদি আসে এবং জরুরী কিছু না হলে সে যেন তার দরজায় টোকা না দেয়।

হীরুবাবুর স্ত্রী বিয়োগের প্রায় দু বছর আগে থেকেই উমেশ এ বাড়ীতে কাজ শুরু করে। হাট বাজার, রান্না বান্না ও সময়ে অসময়ে হীরুবাবুকে সঙ্গ দেয়া উমেশের কাজ।

দু ছেলে ও দু মেয়ের কাছ থেকে প্রতি মাসে যে টাকা পেয়ে থাকেন তাতে অর্ধেক টাকাও খরচ হয়না। স্ত্রী যখন জীবিত ছিলেন তখন চিকিৎসার খরচ দিয়েও হাতে অনেক টাকা থাকত। তারপর জমিজমা থেকে যে টাকা আসে তা সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে চলে যায়। জমানো টাকার হিসাব দেখে ঠিক করেছেন অল্প কিছুদিনের ভিতর প্রয়াত স্ত্রীর শ্মশানে একটি স্মৃতিবেদী নির্মান করবেন সাধ্যমত।

রাত দশটায় জাতির উদ্দেশ্যে সরকার প্রধানের ভাষণ সরাসরি সমপ্রচার হবে। এ কথাটি অনেকবার বলেছেন নিজে নিজে। আরেকটু আগে ভাষণ দিলে কি ক্ষতি হত। অন্তত ভাষণ শুনে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যেতে পারতেন। তা না হয়ে রাত দশটায় ভাষণ দেবেন। ইতিপূর্বে কোনো সরকারী কর্মচারীকে সময়ানুবর্তিতার জন্য সতর্ক থাকতে দেখেননি। আটটায় সময় দেয়া হলে নয়টা কিংবা দশটাও বাজতে দেখেছেন। বুড়ো বয়সে দেশীয় এই ভাবধারার প্রতি কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সময় এবং তার মূল্য কি করে দিতে হয় তা ভালো করেই শিখেছেন এবং সে জন্য তিনি আমেরিকান সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ। মনে মনে কথা বলেই যাচ্ছেন। দেশব্যাপী কত লোক অধীর আগ্রহে থাকবে টেলিভিশনের সামনে আর সরকারী কর্মকর্তা যারা এধরনের কর্মকান্ডে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চান না তারা এ দেশে মানুষের মূল্য , শ্রমের মূল্য বা সময়ের মূল্য বুঝবেন কি করে?

হীরুবাবু সন্ধ্যে ছ' ত্রিশ মিনিটে টেলিভিশনের সামনে আসন নিলেন। ইংরেজী কার্টুন অনুষ্টানটি তার কাছে খুব আকর্ষনীয়। সন্ধ্যার ঐ অনুষ্টানে মহাশূন্যে নভোচারী পাঠানোর জন্য সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। বিরোধী দলের বক্তব্য শুনে তিনি খুব খুশী হলেন। বিরোধী দল বলছে প্রযুক্তিগত উন্নতি যা আমেরিকাকে আলোর পথে নিয়ে যাবে তাতে বিরোধী দলের পূর্ন সমর্থন আছে। এ যেন তার মনে চিন্তার এক নতুন উপকরন হিসেবে দেখা দিল। পাশে কেউ নেই যে কারো সাথে এ আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারেন। একা একাই বলছেন --একেই বলে দেশপ্রেম। অনুন্নত দেশের রাজনীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে বলছেন-- অশিক্ষিতগুলো কিছু জানে না বুঝে না। ভালো মন্দের বালাই নেই সবসময় ই কেবল উল্টো কথা বলা।

দেশ যে ব্যাক্তির চেয়ে বড় ক'জন লোক সে কথা বুঝে। ক্ষমতার লোভে দেশের বারোটা বাজানোর মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা কোনোদিনই জন্মাতে পারে না। এ জন্য জানতে হয় পড়তে হয়। কত কত ক'অক্ষর গো মাংসের হাতে এখন দেশের চাবি কাঠি। কতকিছু ভাবছেন আর একা একাই বলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাই বলে টেলিভিশনের পর্দা ছেড়ে চোখ অন্যত্র যাচ্ছে না। কয়েক মূহুর্ত পর আবার লক্ষ্য করলেন সাংবাদিক সাধারন মানুষের মতামত জানার জন্য অনেকের সাথে আলাপ করছে। অন্যান্য সকলের মতই একজন আমেরিকান টেক্স-পেয়ার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলছে----অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার জন্য আমেরিকান সরকার মহাশূণ্যে নভোচারী পাঠাতে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করছে একজন টেক্স পেয়ার হিসেবে আমি গর্বিত।

এ কথা শুনে ভাবলেন উমেশকে ডেকে এনে বলবেন ''দেখ উমেশ, একটি জাতি বড় হতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে উন্নতি শুরু হতে হয়। আমাদের আশে পাশে কি হচ্ছে ? আমরা কেবল শুনি ভাঙ্গনের কথা। আমাদের কি মিলনের কথা শুনার সময় আসেনি। আমরা কি একত্রিত হতে পারব না? 'দৈন্য দশা' কে কপাল থেকে সরিয়ে আমরা কি কোনোদিন ' ধন্য' হতে পারব না'' ? আবার ভাবছেন উমেশ এ সবের কি বুঝবে। একটু গুরুগম্ভীর আলোচনা হলে যেন উমেশের ভালো লাগে না। তা তিনি বুঝতে পারেন।

কার্টুনের ধারাবাহিক পর্বটি সত্যিই উপভোগ করলেন। অনুষ্টানটি দেখে যেন অনেক কিছু শিখলেন । রাত দশটা বাজতে ঢের দেরী। প্রতি সপ্তাহে চারটি করে চিঠি লিখতে হয় ছেলেমেয়েদের কাছে । ভাবছেন এই সুযোগে একটা চিঠি লিখে ফেলবেন কি না। বড় মেয়ে শুক্লা ছাড়া সবাই প্রবাসী। ছেলে মেয়েরা এত বড় হওয়ার পরও বাবা হিসাবে তিনি ভাবতে পারেন না যে, তার ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাবার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য যথেষ্ট দায়িত্ববোধ হয়েছে। তখনই রাগ আসে প্রয়াত স্ত্রীর উপর। এই অসময়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন কি এতই বেশী ছিল !বুড়ো বয়সে আবার ব্যাচেলর (**Bachelor)** জীবনে ফিরে যেতে হয়েছে এ যে ভাবনার অতীত। এ যে কেবল চোখের জল ঝরায়। স্ত্রীর ছবিতে একটি মালা ঝুলিয়ে বিছানার পাশে রেখেছেন। নিজেকে যতই ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেন না কেন হঠাৎ করে যেন হতাশা এসে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। কত কথা মনে পড়ে সংসার জীবনের। প্রাণবন্ত রূপটি যার মাধ্যমে সংসারে এসেছিল তার বিদায়ে সবই যেন বিদায় নিল স্বার্থপরের মত। কেবল কষ্ট রেখে গেল তার বুড়ো বয়সের জন্য যে টুকু নিতে পারল না। মেয়েদের তুলে দিলেন পরের ঘরে অত:পর পুত্রবধু আনলেন। সকলের কাছে যেন একটিই পাওনা ছিল আর সবাই যা দিয়েছে উজার করে তা হলো শূন্যতা। দু বছর বা তিন বছর পর পর ওরা দেশে আসে। আট থেকে দশ সপ্তাহ থাকে বাবাকে ঘিরে। নাতী নাতনীরা চিঠি লিখে ইংরেজীতে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলে। হীরুবাবু মনে মনে ভাবছেন ফিরিঙ্গির সাথে আত্মীয়তা না করেও নাতী নাতনীরা বাংলা ভুলে যাচ্ছে। নিজে চার বৎসর আমেরিকাতে থাকার পরও স্থায়ী বসবাসের চিন্তা করেননি। জীবনকে উপভোগ করার জন্য আমেরিকান সমাজে তার জন্য কোনোকিছুর কমতি ছিল না। ছেলেমেয়েদের প্রবাসী হওয়াকে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করে নিজেকে শান্তনা দেন। এত ভাবনা এসে আক্রমন করে ফেলল চিঠি লেখা আর সম্ভব হলো না।

এ দিকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেল। আর মাত্র পনের মিনিট পর শুরু হবে বিবিসি রেডিওতে বাংলা অনুষ্টান। এই ক'মিনিট বাহিরে পায়চারি করছেন।

হীরুবাবুকে বাহিরে পায়চারি করতে দেখে উমেশ অবাক হলো। তাকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন কোনো প্রকারের ব্যঘাত না ঘটায়। টেলিভিশন বা রেডিওতে কখন কি অনুষ্টান হয় সে জানে না তবে বাংলা ছবির দিন তাকে ডাকলে সে খুব খুশী হয়। উমেশ লক্ষ্য করল হীরুবাবু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছেন।

গত বছর ঠিক এ সময় হীরু বাবুকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। পরে হীরুবাবুই একদিন উমেশকে ডেকে বললেন বড় ছেলের দিকের নাতনীটির পেটে এপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন হবে। উমেশ ভাবছে আজ দুপুরে যে চিঠিটি এসেছে তাতে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ আছে। সে দোষারুপ করছে হীরুবাবুর ছেলেমেয়েদের কেনই বা তারা তাদের

খারাপ সংবাদ বুড়ো বাবাকে জানায়। হীরুবাবুকে দেখে উমেশের কষ্ট হয়। প্রয়াত স্ত্রীর ফ্রেম করা ছবির পাশে বসে বাবুকে কাঁদতে দেখেছে সে। তারপর নাতী-নাতনীর অসুখ, মেয়ের জামাইয়ের চাকুরী চলে গেল ছোটো ছেলের ব্যবসায় প্রচুর দেনা---- এ সব না বললেই কি নয় !এই বুড়ো মানুষটার মনের ব্যাথা কেউ বুঝতে চায় না। সে জানে বাবুর ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় অনেক বড় মানুষ। এই মূহুর্তে মনে হচ্ছে অকাজের। নইলে এত শিক্ষিত হয়ে বুড়ো বাবার কষ্টের কথা, একাকীত্বের কথা, কি ওরা বুঝতে পারে না--ছি:ছি। সে এখনও তার মাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এই মূহুর্তে যেন তার মায়ের
কথা আবার মনে পড়ল।

বারান্দায় পায়চারী করতে করতে আনমনা হয়ে হীরুবাবু হেঁটে হেঁটে বাড়ীর বাহির চলে গেলেন। ঘর থেকে বের হয়ে উমেশ আর দেখতে পেল না। বাড়ীতে অনেকগুলো ঘর । সবগুলো ঘর খুঁজে দেখা বেশ সময়ের ব্যাপার। সন্ধ্যায় প্রতিটি ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেখানো তার দায়িত্ব। হীরুবাবু বাড়ীর বাহির গেলে সে একাই থাকে। কখনও এত নির্জন মনে হয় যেন শ্মশানের মত। হীরুবাবু বাহিরে গেলে সে একাই থাকে। হীরুবাবুর স্ত্রী যখন শয্যাশায়ী ছিলেন তখনও মনে হত বাড়ীতে কিছুটা হলেও প্রাণ আছে। উমেশ ভাবছে বাবুকে বলবে অন্য ঘরগুলোতে কাউকে থাকার অনুমতি দিতে। কতলোক সর্বহারার মত ঘুরছে। এ ও সে চিন্তা করল যদি বাবুকে বলে আরেকটা কাজের লোক রাখতে তবে তা অপব্যায়ের মত মনে হতে পারে।

আজ রাতে বাবু কখন যে বলবেন ভাত খাওয়ার কথা সে জানে না । বাবু আবার টান্ডা ভাত খেতে পারেন না। বাবুর স্ত্রী যখন জীবিত ছিলেন স্বামী বাড়ী ফেরার পর উমেশকে ডেকে বলতেন--ওরে উমেশ তোর বাবু বাড়ী ফিরেছে, ভাত গরমে দিয়ে রাখ। হীরুবাবুর ঘরে একটু উঁকি দিয়ে উমেশ দেখল টেলিভিশন বন্ধ। জানালাগুলো খোলা। হাসনা হেনা ফুলের গন্ধে ঘর মোহিত হয়ে আছে। টেবিল ল্যামপ শুধু জ্বলছে। রেডিওতে কোনো শব্দ শুনা যাচ্ছে না। বাবু কিছুক্ষনের জন্য বাহিরে গেলেও রেডিওতে শব্দ শোনা যায়। ঘরের আলনাতে উপরের
দিকে বাবুর প্রয়াত স্ত্রীর শাড়ীগুলো ভাঁজ করা। কয়েকটা ছবি বাঁধানো আলনার উপরে। দিন কয়েক আগে হীরুবাবুর অনুমতিক্রমে ছবির ফ্রেমগুলো মুছে পরিষ্কার করেছে। টেবিলের উপর রাখা বড় ছবিটি কাগজের ফুল দিয়ে মোড়ানো। তার নীচে বেশ কিছু তাজা ফুল দেখা যাচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় কেউ দেখা করতে আসেনি বাবুর সাথে। পাশের বাড়ীর বাতের রোগী ধীরেন্দ্র সাধুও আজ
আসেন নি। কত চিকিৎসা করে বাতব্যাধির কোনো উন্নতি না হওয়ায় এখন হীরুবাবুর দেয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধ খাচ্ছেন। দেশ বিদেশের কোনো বিশেষ খবর হলে শুরু হয় দু জনের মধ্যে আলোচনা। তা আবার চলতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা আর প্রতি ঘন্টায় উমেশের চা পরিবেশন। না দুধ না চিনি এমন চা কেন যে পান করতে চান এই দু'জন সে বুঝতে পারে না। ধীরেন্দ্র সাধুর না আসাতে উমেশ ভাবল হয়ত হীরুবাবু সেখানেই আছেন। নইলে এত সময় দরজা খোলা রেখে কোথাও যাওয়ার কথা নয়। অন্তত বলে যেতেন-- উমেশ একটু খেয়াল রাখিস।

রাতের রান্না শেষ করে উমেশের হাতে কোনো কাজ ছিল না। আজ বাজার করে এসে হিসাব দেয়া হয়নি। প্রতিদিন খাবারের পর কম বেশী কথা হয় বাবুর সাথে। তখনই বাজারের হিসাব দেয় সে। তা ছাড়া আরও কত কথা।

কখনও কখনও হীরুবাবু কেবল দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলেন এবং তার নীরব অশ্রুবর্ষণের স্বাক্ষী থাকে উমেশ। দু দিন আগে বাজারের কথা আলাপ করতে করতে হীরুবাবু হঠাৎ
উমেশকে বললেন--ওরে উমেশ, আমার স্ত্রী তখনো অসুস্থ। বুঝলি, ছোটো মেয়ের বিয়ের আলাপ এলো হঠাৎ করে। তোর দিদির সে কি আনন্দ। যেন রাত পোহালেই বিয়ের আয়োজন করতে বলবেন। আমাকে বললেন 'যতই তুমি বলো না কেন ওরকম পাত্র আমি হাতছাড়া হতে দেবো না। কিন্তু সে পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে হলো না। কত যে সুগৃহিণী ছিলেন তিনি। সেই মানুষটা আমাকে ছেড়ে-- --- ----।

উমেশ কিছু বলল না। প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারল না। কেন বিয়ে হলো না বা কি সমস্যা হয়েছিল এই প্রশ্নগুলো তার বুকের ভিতর আটকা পড়ল।
হীরুবাবু আবার উমেশের কাছে জানতে চাইলেন---ওরে আমার ছেলেমেয়েরা বড় হলো। লেখাপড়া শেখালাম। এই বুড়ো বয়সে কেউ আমার কাছে নাই। স্বার্থপরের মত তোর দিদিও চলে গেলেন রে চলে গেলেন। কি যে অপরাধ আমার বলে গেলেন না। আজ কতটা বছর সে শাস্তি তিনি আমায় দিচ্ছেন।
এ প্রশ্নের উত্তর কি উমেশ জানে না। তবুও তার সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে বলল--বাবু, সবাই একা আসে একাই যায়। এইতো সংসারের নিয়ম।
আজ হীরুবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল সে রাতে বাবুকে ঐ উত্তর দেয়া ঠিক হয়নি। বুড়ো মানুষটাকে দূ:খের মধ্যে আরো দূ:খ দিয়েছে। কি যেন একটা অপরাধবোধ তার মধ্যে দেখা দিল। তাড়াতাড়ি করে সবগুলো দরজা বন্ধ করে বাবুর ঘরে আবার গেল। না, টর্চলাইট টেবিলের উপরে আছে। পায়চারি করার সময় বাবুর হাতে টর্চলাইট দেখেনি। টর্চলাইট হাতে নিয়ে গেল ধীরেন্দ্র সাধুর বাড়ী।
উমেশকে দেখেই তিনি বললেন--ওরে তোর বাবুর আজ কি হলো? আজ একবারও খবর নিতে এলেন না !
উমেশ বলল--আমি ভাবলাম বাবু হয়ত এখানে এসেছেন। ভাত রেধে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি।
ধীরেন্দ্র বললেন--আমিও তো মনে মনে অপেক্ষা করছি। যাই হোক তুই বলিস মালিশ দেয়াতে বেশ কাজ হয়েছে। আর নতুন ঔষধের জন্য লোক পাঠিয়েছি।
উমেশ আর কথা বাড়াল না। সে ভাবছে এই অমাবশ্যার রাতে বাতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার কথা নয়। কাউকে কিছু বলার পূর্বে এত বড় বাড়ীটা ভালো করে ঘুরে দেখা দরকার। না, বাবুর ঘরের দরজা যে রকম আটকানো ছিল সে রকমই আছে। ঘরের সামনে পিছনে খুঁজতে লাগল। উমেশের দু:শ্চিন্তা বেড়েই চলছে। গেল ক'দিন যাবৎ হাই প্রেসার বেড়েছে বলে প্রতি রাতেই প্রেসারের ঔষধ খাচ্ছেন। তবে কি মাথা ঘুরে কোথাও-- ---- ----।
ইতস্ত:ত করতে লাগল উমেশ। অমঙ্গলের কিছু দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বাড়ির দক্ষিণের অংশে দুটো ঘর। তার পাশে এক সাড়িতে অনেকগুলো সুপারি গাছ। সামান্য দূরে বেশ ক'টি নারিকেল গাছ। আরেকটু এগুলে পুকুর ঘাট। পুকুরের অপরপ্রান্তেই বাবুর স্ত্রীর শ্মশান। বাবু স্নান করতে এলে প্রতিদিন অনেকক্ষন তাকিয়ে থাকেন শ্মশানের দিকে।
একটু দূর থেকেই উমেশের চোখ পড়ল পুকুরের অপর প্রান্তে। শ্মশানের এক কোনে একটি বাতি জ্বলছে। বাতাসে বাতির শিখাকে একটু ছোটো আবার একটু বড় দেখাচ্ছে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে উমেশের। সন্তর্পনে পুকুরপারে আসল। পুকুরঘাটে এসে একটু দাঁড়াল। অমাবশ্যার রাত ঘন অন্ধকার। সুপারি গাছ থেকে কি যেন পড়ল। শব্দটা খুব প্রকট মনে হলো। সাথে সাথে তার মন দূর্বল হয়ে গেল। সে শুনেছে শ্মশনের দিকে টর্চ জ্বালাতে নাই। এতে অমঙ্গল হতে পারে। বাতি না জ্বেলে কোনো শব্দ না করে আরও সাহস নিয়ে আরও সামনে এগুতে লাগল। অস্পষ্ট ভাবে দেখত পেল সাদা পোষাকে মানব আকৃতির কি যেন বসে আছে শ্মশানের পাশে। তার হাঁটুতে যথারীতি কমপন শুরু হয়ে গেছে। হীরু বাবুর তো এখানে আসার কথা নয়। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু। সামনে যাবে কি যাবে না ভেবে পাচ্ছে না। মনে মনে দুর্গা-দুর্গা ডাকছে। তারপর কয়েক পা সামনে এলো চোখ বন্ধ করে।
এবারে সে নিশ্চিত হলো এযে হীরুবাবু। এতটাই নীরব ছিল উমেশ, হীরুবাবু তার উপস্থিতি টের পান নি। তিনি ঠোঁঠ নেড়ে কি যেন বলছিলেন। আরো একটি মোমবাতি জ্বালালেন সাথে কিছু ধুপকাটি।
উমেশের মনে হলো বাবুর খাবারের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিশনে ভাষণ শুনার সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। তাই ডাকতে উদ্যত হলো। না, উমেশের মন বাধা দিল। সে নিজে সংসারী হয়নি। কোনোদিন হবেও না। জীবনে স্ত্রীর মূল্য কতটুকু হীরুবাবুকে দেখে সে কিছুটা শিখতে পেরেছে। প্রকৃত হিসাব সে জানে না। সেই স্ত্রী পরপারে

চলে গেলে কি কষ্ট ! সে ভাবতে পারে না । সে সইতে পরবে না। হয়ত হীরুবাবু সকল কষ্ট প্রকাশ করেন না। চোখের জলের ভাষা, তার গড়িয়ে পরার শব্দ এবং সে শব্দের মাঝে নিহিত সুর ছন্দ তালের মাত্রা অন্তর্যামী বিনে আর কে জানে।

উমেশ সন্তর্পনে ফিরে এলো। এ ভাবে শ্মশান বাতি কতক্ষন, কতদিন হীরুবাবুর মনে ও প্রয়াত স্ত্রীর শ্মশানে জ্বলবে---সে জানে না।

১৮ ০২ ৯৯ Maroubra Beach Sydney

banglaaussie@yahoo.com.au